প্রস্তাবনা

ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যের প্রধান ও প্রথম লক্ষণ আধুনিকতা আর এই আধুনিক বাঙালির মননশীলতার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে রয়েছে গদ্য সাহিত্য। যদিও এই দশকেই বাংলা গদ্য সাহিত্যের জন্ম, কিন্তু রাজা রামমোহন রায় (১৮১৫-১৮৩৩-রচনাকাল) থেকে শুরু করে অতি দ্রুত এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৪১-১৮৮৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮৪৭-১৮৯১), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮৫৬-১৮৯২), প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর , রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও রাজনারায়ণ বসুর লেখনী বাহনে সওয়ার হয়ে সেই গদ্যসাহিত্যএসে পৌঁছায় এই শতকের শ্রেষ্ঠ গদ্যকার বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। তার পরের ইতিহাস আর কোনো সাহিত্য রসিক বাঙালির অজানা নয়। একদিকে বাংলা উপন্যাসের সার্থক রূপায়ন অন্যদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমান্তরাল একাধিক প্রবন্ধ রচনা করে বাঙালির মননকে তিনি ঐশ্বর্যের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। একথা অনস্বীকার্য যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সৃষ্টির ১৮৬৪-১৮৮৮ এই চব্বিশ বছরে বাংলা গদ্যসাহিত্যকে এমন এক সবল ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে এক আদর্শ পরিকাঠামো দান করেছিলেন যে সেখান থেকে খুব সহজেই সাহিত্যের উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক লেখক গোষ্ঠী, পাঠক ও সমালোচকবর্গকে যুক্তিনিষ্ঠ পরিণত মননের একেবারে মুখোমুখি এনে উপস্থিত করতে সফল হয়েছিলেন। তাঁর জমি অনেক আগে থেকেই তৈরি ছিল— তাই এই মাহেন্দ্রক্ষণে আবির্ভূত হয়ে রবীন্দ্রনাথ আপন প্রতিভার উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটায় সমগ্র বিশ্বসাহিত্যকে আলোকিত করে তুললেন। সাহিত্যের কোনো বিভাগকে তিনি উপেক্ষা করেন নি আর যেখানেই তাঁর স্পর্শ লেগেছে সেখানেই সাহিত্যের ঘটেছে নবজন্ম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম প্রবন্ধ লেখেন জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব পত্রিকায় 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী' নামক সমালোচনা প্রবন্ধ তখন তাঁর বয়স মাত্র চোদ্দ বছর। প্রবন্ধে তিনটি কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে খন্ডকাব্য, গীতিকাব্য ও মহাকাব্যের লক্ষণাদি বিচার করে বালক লেখক খুব ঘটা করে ও গম্ভীর ভাবে প্রমান করেছেন যে কাব্য তিনটিতে প্রকৃত গীতিকাব্যের লক্ষণ ও কবিপ্রতিভা প্রকাশ পায় নি। এরই সমসাময়িক অন্যান্য প্রবন্ধগুলি ও সমালোচনামূলক রচনা— বেয়াত্রিচে দান্তে ও তাঁহার কাব্য (১৮৭৮), পের্ত্রাক-লর‍্যা (১৮৭৮), গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িণীগণ (১৮৭৮) , ইংরেজদিগের আদব কায়দা (১৮৭৮), স্যাকসন জাতি ও অ্যাংলো স্যাকসন সাহিত্য এবং নর্মান জাতি ও অ্যাংলো নর্মান সাহিত্য। ১৮৭৭ সালে মাইকেল মধুসূদন ও তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা করে তাঁর রচিত প্রবন্ধ ভারতীতে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাংলা সাহিত্যে সাড়ম্বর আগমনী ঘোষিত হয়ে যায়। এই সমালোচনায় কৈশোরের ঔদ্ধত্য ছিল নিঃসন্দেহে কিন্তু প্রাবন্ধিকের বক্তব্যের মৌখিক বিশ্লেষণ গুলিকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

'বঙ্গীয় পাঠকসমাজে যে-কোনো গ্রন্থকার অধিক প্রিয় হইয়া পড়েন, তাঁহার গ্রন্থ নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিতে কিঞ্চিৎ সাহসের প্রয়োজন হয়। তাঁহার পুস্তক হইতে একবিন্দু দোষ বাহির করিলেই, তাহা ন্যায্য হউক বা

অন্যায্যই হউক, পাঠকেরা অমনি ফণা ধরিয়া উঠেন। ভীরু সমালোচকেরা ইহাদের ভয়ে অনেক সময়ে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিতে সাহস করেন না। সাধারণ লোকদিগের প্রিয় মতের পোষকতা করিয়া লোকরঞ্জন করিতে আমাদের বড়ো একটা বাসনা নাই। আমাদের নিজের যাহা মত তাহা প্রকাশ্যভাবে বলিতে আমরা কিছুমাত্র সংকুচিত হইব না বা যদি কেহ আমাদের মতের দোষ দেখাইয়া দেন তবে তাহা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে আমরা কিছুমাত্র লজ্জিত হইব না। এখনকার পাঠকদের স্বভাব এই যে, তাঁহারা ঘটনাক্রমে এক-একজন লেখকের অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন, এরূপ অবস্থায় তাহারা সে লেখকের রচনায় কোনো দোষ দেখিতে পান না, অথবা কেহ যদি তাহার কোনো দোষ দেখাইয়া দেয় সে দোষ বোধগম্য ও যুক্তিযুক্ত হইলেও তাঁহার সেগুলিকে গুণ বলিয়া বুঝাইতে ও বুঝিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

আমাদের পাঠকসমাজের রুচি ইংরাজি-শিক্ষার ফলে একাংশে যেমন উন্নত হইয়াছে অপরাংশে তেমনি বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ভ্রমর, কোকিল, বসন্ত লইয়া বিরহ বর্ণনা করিতে বসা তাহাদের ভালো না লাগুক, কবিতার অন্যসকল দোষ ইংরাজি গিলটিতে আবৃত করিয়া তাঁহাদের চক্ষে ধরো তাঁহারা অন্ধ হইয়া যাইবেন। ইঁহারা ভাববিহীন মিষ্ট ছত্রের মিলনসমষ্টি বা শব্দাড়ম্বরের বিপরীতাচরণ করেন। শব্দের মিষ্টতা অথবা আড়ম্বর তাঁহাদের মনকে এমন আকৃষ্ট করে যে ভাবের দোষ তাঁহাদের চক্ষে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

আমরা এবারে যে মেঘনাদবধের একটি রীতিমতো সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া অনেক পাঠক বিরক্ত হইয়া কহিবেন যে অত সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়া পুস্তকের দোষগুণ ধরা অনাবশ্যক, মোটের উপর পুস্তক ভালো লাগিলেই হইল । আমরা বলি এমন অনেক চিত্রকর আছেন, যাঁহারা বর্ণপ্রাচুর্যে তাঁহাদের চিত্র পূর্ণ করেন, সে চিত্র দূর হইতে সহসা নয়ন আকর্ষণ করিলেও প্রকৃত শিল্পরসজ্ঞ ব্যক্তি সে চিত্রকরেরও প্রশংসা করেন না, সে চিত্রেরও প্রশংসা করেন না, তাঁহারা বিশেষ বিশেষ করিয়া দেখেন যে, চিত্রে ভাব কেমন সংরক্ষিত হইয়াছে, এবং ভাবসুদ্ধ চিত্র দেখিলেই তাঁহারা তৃপ্ত হন। কাব্য সম্বন্ধেও ঐরূপ বলিতে পারা যায়।'(১)

প্রথমবার বিলেত প্রবাস রবীন্দ্রনাথকে য়ুরোপীয় সমাজ ও সভ্যতার অত্যন্ত কাছাকাছি এনে দিয়েছিল। সরাসরি চোখে দেখে অত্যন্ত কাছ থেকে তিনি তাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে প্রাচ্যের সঙ্গে সে দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্বকে বিশেষভাবে লক্ষ করেছেন। য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র যখন প্রথম ভারতীতে প্রকাশিত হতে শুরু করে তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স আঠারো বছর। আর য়ুরোপ থেকে লেখা এই চিঠিগুলির বেশিরভাগই তাঁর নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীকে উদ্দেশ্যকরে । একাধারে বন্ধু ও অতিপ্রিয় এই বৌঠানের কাছে পূর্ণযুবা রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার পাশ্চাত্য সমাজের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজের মনের অভিজ্ঞতার উচ্ছ্বাসটুকু সযত্নে প্রকাশ করে ফেলেছেন। এখানেও দেখব সমালোচনার মধ্যে দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমাজ ও সভ্যতার বিভিন্ন দিক গুলি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বিলেত থেকে ফেরবার দেড় বছর পরে চিঠিগুলি গ্রন্থাকারে য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র নাম নিয়ে প্রকাশিত হলে ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন যে এই গ্রন্থ পড়ে কারো কোনো উপকার না হোক, একজন বাঙালি ইংলন্ডে গেলে কী ভাবে তার মতামত

গঠিত ও পরিবর্তিত হয় তার একটি ইতিহাস পাওয়া যাবে।

এবারে চলে আসি রবীন্দ্রসাহিত্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ছয় দশকের প্রথমটিতে. ১৮৮১-১৮৯০। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের জীবনে ঘটে গেছে অভূতপূর্ব ঘটনা সদর স্ট্রীটের বাড়ীর বারান্দা থেকে দেখা নারকেল পাতার ঝালরের মধ্যে দিয়ে সূর্যোদয়— ' আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।'(২)

প্রথম দশকে অর্থাৎ ১৮৮১-১৮৯১ টুকরো টুকরো অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। রামমোহন রায়কে স্মরণ করে যেমন বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তেমনি আবার সমাজ সম্পর্কিত সচেতন মন প্রকাশ পেয়েছে চিঠিপত্র-র প্রবন্ধ গুলিতে। কিন্তু এ পর্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তামূলক গদ্য বোধহয় তাঁর 'মন্ত্রী-অভিষেক' প্রবন্ধটি। ১৮৯০ সালে ইংরেজ সরকারের কর্মসংসদে ভারতীয় সদস্য বাড়ানোর বিষয় নিয়ে তুমুল বাগবিতন্ডা শুরু হলে রবীন্দ্রনাথ ডিমোক্রেসির পক্ষে জোর গলায় বক্তব্য রাখলেন— 'গবর্মেন্টের দ্বারা মন্ত্রী নিয়োগ অপেক্ষা সাধারণ লোকের দ্বারা মন্ত্রী অভিষেক অনেক কারণে আমাদের নিকট প্রার্থনীয় মনে হয়। '(৩) কিন্তু এই দাবি যে রবীন্দ্রনাথের মনোমত হয়েছিল এমন নয়। একই সঙ্গে তিনি এও জানিয়েছিলেন যে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এ ছিল তাঁর ওকালতি ' সে পথের পরিমিত ভিক্ষার প্রার্থীদের হয়ে'। রবীন্দ্রনাথ সচকিত করে তুললেন বাংলা দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতাদের — 'হিন্দুমেলার উপহার' (১৮৭৫)-এবার সবল প্রতিবাদ হয়ে দেখা দিল।

পরবর্তী দশক ১৮৯১-১৯০০ রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্প সৃষ্টির সাধনায় উৎসর্গীকৃত। পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে জমিদারী পরিদর্শনের শুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন কখনও জলপথে পদ্মার বুকে কখনও বা স্থলপথে । যেখানে গেছেন সেখানেই কেমন করে যেন নতুন মানুষ, নতুনতর প্রকৃতির সন্ধান পেয়েছেন তিনি । আর সেই মানুষ, সেই প্রকৃতি স্বমহিমায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে গল্পকারের বলনে। 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়রী' দুইখন্ডে প্রকাশিত হয় এই পর্বে। এছাড়া একটি মাত্র প্রবন্ধের সংকলন 'পঞ্চভূতের ডায়েরী' ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সমস্ত দশকের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি রচনার অন্যতম বলে এই সংকলনটি গণ্য করা হয়। যে প্রকৃতি ছবি হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর ছোটোগল্পে সেই প্রকৃতি তাঁর পঞ্চভূতে বিশ্লিষ্ট হয়ে অনেক চিন্তা অনেক যুক্তি অনেক বস্তু নিয়ে জড়ো হয়েছে বিতর্ক সভায়। কারো বক্তব্য কোনো অংশে খাটো নয় কিন্তু কি অদ্ভুত বৈপরীত্য প্রত্যেকের মতবাদে। যে কোনো যুক্তিক্রম সাজানোর একটা বড়ো পদ্ধতি হলো বিরোধী যুক্তিগুলিকে খন্ডন করা। 'পঞ্চভূত' অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ , মরুৎ ও ব্যোম— এই পাঁচটি ভূত পাঁচটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ তাদের পৃথক নামকরণ করেছেন ক্ষিতি, স্রোতস্বিনী , দীপ্তি, সমীর ও ব্যোম। এই পাঁচটি মানুষের তর্ক-বিতর্ক ও কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে যে মূল সত্যটি রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তা হলো ' art for arts sake '। নন্দনতত্ত্বের বিভিন্ন আলোচনার সূত্রে এই মূল সিদ্ধান্তে রবীন্দ্রনাথ উপনীত হতে চেয়েছেন। যদিও পরবর্তী সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে আমরা দেখেছি তিনি সাহিত্যে কলাকৈবল্যবাদকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন নি। কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে প্রবন্ধ রচনার রীতি বহু প্রাচীন। প্লেটো থেকে শুরু করে বহু

বিখ্যাত পাশ্চাত্য সাহিত্যিকেরা এই ধরনের সার্থক রচনা করেছেন এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব'-এ এই আঙ্গিক গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনার বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর চরিত্রের নামকরণ। তিনি চরিত্র থেকে সরে এসে পৃথক কোনো নামকরণ করেন নি। অর্থাৎ তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের নাম গুলি আরোপিত নয়, তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যের বিষয়গুলিই এক একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। একটু উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে বুঝে নেওয়া যাক।

'সেখান হইতে একটা সরু সুরের সানাই এবং গোটাকতক ঢাকঢোলের শব্দ শোনা গেল। সানাই অত্যন্ত বেসুরে একটা মেঠো রাগিনীর আরম্ভ অংশ বারংবার ফিরিয়া ফিরিয়া নিষ্ঠুরভাবে বাজাইতেছে এবং ঢাকঢোলগুলো যেন অকস্মাৎ বিনা কারণে খেপিয়া উঠিয়া বায়ুরাজ্য লন্ডভন্ড করিতে উদ্যত হইয়াছে।

সোতস্বিনী মনে করিল নিকটে কোথাও বুঝি একটা বিবাহ আছে।

. . . . . .

আমি ঘাটে বাঁধা নৌকার মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

কীরে বাজনা কিসের?

সে কহিল— আজ পুণ্যাহ।

. . . . . .

আমি কহিলাম— পুণ্যাহ অর্থে জমিদারী বৎসরের আরম্ভ দিন। আজ প্রজারা যাহার যেমন ইচ্ছা কিছু কিছু খাজনা লইয়া কাছারি-ঘরে টোপর পরা বরবেশধারী নায়েবের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিবে। . . . . . অর্থাৎ খাজনা দেনা-পাওয়া যেন কেবলমাত্র স্বেচ্ছাকৃত একটা আনন্দের কাজ। ইহার মধ্যে একদিকে নীচ লোভ অন্যদিকে হীন ভয় নাই। . . . . . ।

দীপ্তি কহিল— কাজটা তো খাজনা আদায়, তাহার মধ্যে আবার বাজনা বাদ্য কেন?

ক্ষিতি কহিল— ছাগশিশুকে যখন বলিদান দিতে লইয়া যায় তখন কি তাহাকে মালা পরাইয়া বাজনা বাজায় না, আজ খাজনা-দেবীর নিকটে বলিদানের বাদ্য বাজিতেছে।

ক্ষিতি কহিল— আমি তো বলি যেটার যাহা সত্যভাব তাহাই রক্ষা করা ভালো; অনেক সময় নীচ কাজের মধ্যে উচ্চভাব আরোপ করিয়া উচ্চ ভাবকে নীচ করা হয়।

আমি কহিলাম— ভাবের সত্যমিথ্যা অনেকটা ভাবনার উপরে নির্ভর করে। আমি একভাবে এই বর্ষার পরিপূর্ণ নদীটিকে দেখিতেছি, আর ঐ জেলে আর একভাবে দেখিতেছে— আমার ভাব যে একচুল মিথ্যা এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারি না। · · · আমি কহিলাম— উৎসব মাত্রই তাই। মানুষ প্রতিদিন যে ভাবে কাজ করে, এক একদিন তাহার উল্টাভাবে আপনাকে সারিয়া লইতে চেষ্টা করে। প্রতিদিন উপার্জন করে, একদিন খরচ করে; প্রতিদিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে, একদিন দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়; প্রতিদিন গৃহের মধ্যে আমিই গৃহকর্তা , আর একদিন আমি সকলের সেবায় নিযুক্ত। সেইদিন শুভদিন, আনন্দের দিন, সেইদিনই উৎসব । সেইদিনই সংবৎসরের আদর্শ। সেদিন ফুলের

মালা, স্ফটিকের প্রদীপ, শোভন ভূষণ— এবং দূরে একটি বাঁশি বাজিয়া বলিতে থাকে, আজিকার এই সুরই যথার্থ সুর, আর সমস্তই বেসুরো। বুঝিতে পারি, আমরা মানুষে মানুষে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হইয়া আনন্দ করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু প্রতিদিনের দৈন্যবশত তাহা করিয়া উঠিতে পারি নাই, যেদিন পারি সেইদিনই প্রধান দিন ।'(৪)

পদ্মার বিস্তীর্ণ উদার অঞ্চল ছেড়ে এবার নীড় বাঁধলেন তাল, শাল, অর্জুন গাছে ঘেরা নিভৃত সাওঁতাল পল্লী শান্তিনিকেতনে। ১৯০১-১৯১০ এই দশটা বছর রবীন্দ্রনাথের জীবনের সব থেকে বিষাদময় পর্ব। একাধিক প্রিয়জন-বিয়োগ, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, নিষ্ঠাবান আশ্রম শিক্ষক , রবীন্দ্রনাথকে সমস্ত বিশ্ব থেকে পৃথক করে এনেছিল। কিন্তু এই নিভৃত প্রবাস রবীন্দ্রনাথের জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া না, সমস্যা থেকে পালিয়ে যাওয়া নয় — এ হলো তাঁর আত্মপ্রস্তুতির পর্ব। উপনিষদের মন্ত্রে আত্মদীক্ষিত রবীন্দ্রনাথের আসন্ন বিপ্লবের জন্য আত্মশুদ্ধির সময়। এই পর্বে তাঁর রচনায় একদিকে যেমন আধ্যাত্মিক চেতনার বলিষ্ঠ প্রকাশ অন্যদিকে তেমনি দেখি স্বদেশ-সমাজ সম্পর্কে স্বাভাবিক সচেতনতা। অজস্র প্রবন্ধ তিনি এই পর্বে লিখেছেন ঔপনিষদ ব্রহ্ম, আত্মশক্তি, ধর্ম, শান্তিনিকেতনের প্রবন্ধগুলি, অন্যদিকে ভারতবর্ষ, চারিত্রপূজা, বিচিত্র প্রবন্ধ সমূহ, রাজা ও প্রজা, স্বদেশ, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি। কিন্তু আরও একপ্রকারের প্রবন্ধ তিনি এই পর্বে লিখতে শুরু করেন। সেগুলি হলো বিশুদ্ধ সহিত্যবিষয়ক । প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য-এর প্রবন্ধসমূহ। সাহিত্য সৃষ্টির শেষদশক ছাড়া এত বৈচিত্র্যময় প্রবন্ধ তিনি কেবলমাত্র এই দশকেই রচনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মেরই প্রতি আনুগত্য বহন করেন নি, অল্প বয়সে কিছুদিন ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু শীঘ্রই তিনি ধর্মের নামে ব্যাভিচারের নগ্ন রূপটিকে চিনে নিয়েছিলেন। তবু আজন্মের সংস্কার ও পিতৃদেবের আদর্শ সম্পূর্ণ অতিক্রম করা তাঁর পক্ষেও সম্ভব ছিল না। তাই তরঙ্গ ঊর্মিল দীর্ঘ জীবনপথে নিছক আধ্যাত্মিক বা একান্ত ধর্মবিরোধী কোনো বিশিষ্ট রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যাবে না।

আশ্রমগুরু রোজ খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে উঠে যান মন্দিরে উপাসনা গৃহে। উপাসনা অন্তে সমবেত শিক্ষক ও ছাত্রদের শোনান কিছু কথা, সেদিনের সেই শান্ত মুহূর্তের উপলব্ধি। এই উপলব্ধিই গীতাঞ্জলির গানে আর 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালার মধ্যে ধরা পড়ে। ধ্যানে আর গানে একাকার হয়ে একটা অনির্বচনীয় ভাবরস উপভোগ করেন। এতো তাঁর পিতার কাছে শেখা। কিন্তু তাঁর ভাবনা নিছক নিরাকারে ঈশ্বর সাধনা নয়। সেখানে স্বদেশ ও সমাজের একটা বড়ো দায় ক্রিয়াশীল থাকে। তাই ব্রাহ্মসমাজের আহ্বানে (১৯০৯) কলকাতার মন্দিরে ভাষণ (পূর্বপশ্চিম) দিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেন — ভারতের ইতিহাস কাদের ইতিহাস ? রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—' রবীন্দ্রনাথ ভাবী রাষ্ট্রের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার প্রতিষ্ঠা অহিংসার উপর, সত্যের উপর, শ্রেয়ের উপর। আজ ভারতকে এক কর্মযোগী মহাত্মার ও এক প্রেমযোগী কবির স্বপ্নকেই রূপ দিতে হবে ।' (৫)

সে সময়টা বাংলার ইতিহাসেও এক বিষাদময় অধ্যায়। এই দশকেই ঘটে বঙ্গদেশের অঙ্গচ্ছেদ। পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই ভাগে বিভক্ত করে দেওয়া হয় বঙ্গদেশকে দুটি পৃথক প্রদেশে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কিছুতেই এই অন্যায়

চুপ করে সহ্য করে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে তিনি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তনের আহ্বান জানালেন। এই তো সুযোগ ইংরেজদের ছাড়িয়ে যাওয়ার। এই সময়কে বৃথা উত্তেজনা সৃষ্টি করে ধ্বংসাত্মক কাজে অপব্যয় কোরো না, ভেঙো না, পুড়িয়ো না, নষ্ট কোরো না । কেবল গড়ো, তৈরি করো, আলো জ্বালো। কিন্তু বয়কট আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতের মিল হলো না। উপরন্তু তাঁর ভাবনাকে কবির কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া হলো। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

' বিদায় দেহো, ক্ষম আমায় ভাই।
কাজের পথে আমি তো আর নাই।' (৬)

প্রকৃত পক্ষে তাঁর এই ক্ষোভও ছিল সাময়িক। কর্মযোগ আর প্রেমযোগকে একপথে মেলাবার প্রয়াস তাঁর জীবনের শেষদিন অবধি চলেছে। বরং দিন যত এগিয়েছে কবি ততো বেশি করে কর্মী হয়ে উঠেছেন এবং জীবনের শেষ-অধ্যায়ে গিয়ে তো কর্মী রবীন্দ্রনাথ পরিণতরূপলাভ করেছে। নিজেকে সরিয়ে নিয়ে তিনি নিজের কর্মক্ষেত্রকে সীমিত করে নিলেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে স্বরাজের আসল বুনিয়াদ-আত্মশাসন প্রবর্তন করলেন। গ্রামের সেবায় খোলা হলো দরিদ্রভান্ডার। আশ্রমে হেডমাষ্টারপ্রথা বাতিল করে শিক্ষকদের ওপর সংঘগত দায়িত্ব অর্পিত হলো, ছাত্রসংঘ ভার নিল আত্মশাসন ও শৃঙ্খলানির্মানের ও ছাত্র শিক্ষক উভয়ে ব্রতী হলো আশ্রমের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিশুদ্ধ সাহিত্যতত্ত্বালোচনাবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হলো ১৯০৭ সালে। আমরা জানি ঊনবিংশ শতকীয় সাহিত্যের প্রধান লক্ষণই ছিলো বিষয়ীর আত্মতা; রবীন্দ্রনাথও প্রথম দিককার সাহিত্যতত্ত্বাআলোচনায় এই বিষয়ীর আত্মতার প্রবল সমর্থক ছিলেন। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্— ১৮৯২ সালে সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ 'আলোচনা' নামে লোকেন্দ্রনাথ পালিতের উদ্দেশে পত্ররূপ লেখেন তার উত্তরে লোকেন পালিত লেখেন 'সাহিত্যের সত্য' নামে পত্র-প্রবন্ধটি। রবীন্দ্রনাথ আবার তার উত্তরে লেখেন 'সাহিত্য' নামক পত্র প্রবন্ধটি—

'· · · তুমি বলেছ সাহিত্য যদি লেখকের আত্মপ্রকাশই হবে, তাহলে শেক্সপীয়রের নাটককে কী বলবে। . . . আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা এই দুই নিয়ম জীবজগতে কার্য করে। · · · সাহিত্যের কার্যকে তেমনি দুই অংশে ভাগ করা যেতে পারে। আত্মপ্রকাশ এবং বংশ প্রকাশ। গীতিকাব্যকে আত্মপ্রকাশ এবং নাট্যকাব্যকে বংশপ্রকাশ নাম দেওয়া যায়।

· · · শেক্সপীয়র তাঁর নাটকের পাত্রগণকে নিজের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন, অন্তরের নাড়ীর মধ্যে প্রবাহিত প্রতিভার মাতৃরস পান করিয়েছিলেন, তবেই তারা মানুষ হয়ে উঠেছিল; নইলে তারা কেবলমাত্র প্রবন্ধ হ'ত। অতএব এক হিসাবে শেক্সপীয়রের রচনাও আত্মপ্রকাশ। কিন্তু খুব সম্মিশ্রিত বৃহৎ এবং বিচিত্র।'(৭)

পরবর্তী স্তর ১৯১১ থেকে ১৯২০। রবীন্দ্রজীবনের এই অধ্যায়কে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দিয়ে চিহ্নিত করা যায় রবীন্দ্রজীবনের ৫০ বছর পূর্ণ, নোবেল প্রাইজ লাভ, স্যার উপাধি ত্যাগ, আবার একে বিশ্বকবি হয়ে ওঠার দশক নামেও অভিহিত করা যায়। বিশ্বের দরবারে নিজের ও দেশের সাহিত্যের প্রতিনিধি হয়ে আত্মপ্রকাশের শুরু এই

সময়েই। কিন্তু এই সময়ের সব থেকে বড়ো ঘটনা নিঃসন্দেহে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। সমস্ত পৃথিবীতে চিন্তার ধারা, মূল্যবোধের ধর্ম বদলে দিল এই যুদ্ধ। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যেও পড়ল তার প্রভাব। প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র সুযোগ করে দিল সেই পরিবর্তন তুলে ধরার। বিদেশ ভ্রমণ আর শান্তিনিকেতনের নিভৃত আশ্রয় সামন্তরাল ধারায় চলেছে তাঁর এই দশকের চলচ্ছবিতে। বিদেশ ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রবাসকালে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি এ সময়ের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ সংকলন 'Sadhana', ১৯১৬-১৭ তে জাপান ও আমেরিকায় যে অভিভাষণ দিলেন তা সংকলিত হলো 'Nationalism' ও 'Personality' গ্রন্থে। এই দশকের প্রবন্ধ ও অন্যান্য সব রচনায় রবীন্দ্রনাথের আধুনিক মনস্কতা, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি ও সেখানকার মনীষীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠল। গীতাঞ্জলির কবি 'Sadhana' বক্তৃতামালায় বলেছিলেন ব্যক্তির নিত্য সহচর ভগবানের কথা। কিন্তু মাত্র চার/পাঁচ বছরের মধ্যেই তিনি তারও চেয়ে বড়ো ও যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজের প্রয়োজনীয় সমস্যা নিয়ে দরবার করলেন , বললেন সমাজের নিত্য সহচর ব্যক্তির কথা। Capital and labour, Industrialisation Problem, state and individual problem- প্রভৃতি তাঁর বক্তব্যের বিষয় হল আন্তর্জাতিকতা।

তাঁর মতে প্রথম বিবেচিত হলো। কিন্তু তাই বলে স্বাজাত্যবোধ থেকে তাঁকে বিরত হতে দেখি নি। ১৯১৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার আভাস মাত্র পাওয়া গেল অ্যানিবেসান্তের 'হোমারুল' আন্দোলন ও মহাত্মা গান্ধীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সূত্রে। রবীন্দ্রনাথ উৎসাহী ভারতীয়ের হয়ে লিখলেন 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'।

'মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো কথাটাই এই যে, কর্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার। নানা মন্ত্রে, নানা শ্লোকে, নানা বিধিবিধানে এই কথাটা যে-দেশে চাপা পড়ল, বিচারে পাছে এতটুকু ভুল হয় এইজন্য যে দেশে মানুষ আচারে আপনাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধে, চলিতে গেলে পাছে দূরে গিয়া পড়ে এইজন্য নিজের পথ নিজেই ভাঙিয়া দেয়, সেই দেশে ধর্মের দোহাই দিয়া মানুষকে নিজের পরে অপরিসীম অশ্রদ্ধা করিতে শেখানো হয় এবং সেই দেশে দাস তৈরি করিবার জন্য সকলের চেয়ে বড়ো কারখানা খোলা হইয়াছে।

আমাদের রাজপুরুষেরাও শাস্ত্রীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে এই কথাই বলিয়া থাকেন, তোমরা ভুল করিবে, তোমরা পারিবে না, অতএব তোমাদের হাতে কর্তৃত্ব দেওয়া চলিবে না।

আর যাই হোক মনু-পরাশরের এই আওয়াজটা ইংরেজি গলায় ভারি বেসুর বাজে, তাই আমরা তাঁদের যে উত্তরটা দিই সেটা তাঁদেরই সহজ সুরের কথা। আমরা বলি, ভুল করাটা তেমন সর্বনাশ নয় স্বাধীন কর্তৃত্ব না পাওয়াটা যেমন, ভুল করিবার স্বাধীনতা থাকিলে তবেই সত্যকে পাইবার স্বাধীনতা থাকে। নিখুঁত নির্ভুল হইবার আশায় যদি নিরঙ্কুশ নির্জীব হইতে হয় তবে তার চেয়ে না হয় ভুলই করিলাম।'(৮)

১৯২০-২১ প্রায় সমস্ত সময়টাই রবীন্দ্রনাথের কেটেছে বিদেশে-ইউরোপ ও আমেরিকা সফরে। পরবর্তী দশক জুড়েও সেই ভ্রমণ অব্যাহত থেকেছে। ১৯২৪ সালে চীন, জাপান ও শেষের দিকে দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণে যান। ১৯২৬ এ ইটালী, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, জার্মানী, হল্যান্ড, নরওয়ে আবার ইউরোপ ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফিরে

১৯২৭ সালে রওনা হন পূর্বভারতের দ্বীপপুঞ্জের উদ্দেশ্যে। এর পরের ১৯২৯ সালের বিদেশ ভ্রমণ পরবর্তী পর্বে সংযোজিত হবে। ক্রমাগত এই যে চলা তা রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের জড়তাকে ঝেড়ে ফেলে আবার নতুন মন নিয়ে নতুন দৃষ্টি নিয়ে বিশ্বকে নিজের মধ্যে ও নিজেকে সমগ্র বিশ্বের ওপরে মেলে দেওয়ার প্রেরণা জাগিয়ে ছিল। কোনো বিশেষ প্রবন্ধ সংকলন এ পর্যায়ে প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু এই ভ্রমণ ও ভ্রমণ অবকাশে লেখা চিঠিপত্র এবং প্রবাসে প্রদত্ত ভাষণ পরবর্তী দশকে সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতালব্ধ নতুন আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই বিদেশ ভ্রমণের প্রত্যক্ষ ফসল হয়ে দেখা দিল পরবর্তী দশকে। রবীন্দ্রজীবনের শেষ ও পরিণত দশকটির প্রস্তুতি পর্ব রূপে এই দশকটিকে আমরা গ্রহণ করতে পারি।

'এবার আমার জীবনের নতুন পর্যায় আরম্ভ হলো। একে বলা যেতে পারে শেষ অধ্যায়। এই পরিশিষ্ট ভাগে সমস্ত জীবনের তাৎপর্যকে যদি সংহত সুস্পষ্ট করে তুলতে না পারি তাহলে অসম্পূর্ণতার ভিতর দিয়ে বিদায় নিতে হবে।'(৯)

এটি রবীন্দ্রনাথের ১৯২৭ সালে এপ্রিল মাসে (১৩৩৪ ১লা বৈশাখ) লেখা চিঠি। রবীন্দ্রজীবনের প্রতিটি দশক যেমনভাবে তাঁর সাহিত্যের দর্পনে প্রতিফলিত হয়েছে ঠিক তেমনি করেই জীবনের পরিশিষ্ট পর্বে এসে সাহিত্যেও পরিশিষ্ট রচনার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছেন। আর এই সাহিত্যসৃষ্টির একটা প্রধান অংশ হলো তাঁর প্রবন্ধ সংকলন। এই অন্তিম পর্বে রবীন্দ্রপ্রবন্ধে মননের দিকটি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। এই পর্বে রবীন্দ্রভাবনায় যে বড়ো রকমের পালাবদল ঘটেছিল গদ্যছন্দ, নৃত্যনাট্য, চিত্রকলা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রসঙ্গে বক্তব্য ও প্রকরণের নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা তার চেহারা ও চরিত্র স্পষ্ট হবে এই দশকের রবীন্দ্রপ্রবন্ধেও। তাঁর 'পঞ্চভূত' থেকে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' , 'প্রাচীন সাহিত্য থেকে কালান্তর', 'রাশিয়ার চিঠি', 'পল্লীপ্রকৃতি' কিংবা 'সভ্যতার সংকট' পর্যন্ত যে উত্তরণ তারই সূত্র ধরে আমরা এগিয়ে যাব এই দশকের রবীন্দ্রপ্রবন্ধে মননের বৈচিত্র্য ও ঐক্যের সন্ধানে।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৯৬১ সালে অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে গেলেও তার উত্তাপ তখনও আবহাওয়ায় পরিব্যাপ্ত। আর মৃত্যু ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও ভারতের স্বাধীনতা সমাসন্ন। কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের উত্তরাধিকারী হওয়ার সুবাদে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের ঘটনাবলীর আঁচ খুব সহজেই ছেলেবেলা থেকে অনুভব করতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে বিশ্বের প্রেক্ষাপটে একে একে রাজনৈতিক পালাবদল আঘাত করতে থাকে ভারতবর্ষীয় যে ঐতিহ্য ও সংস্কারকে তাকেও এড়াতে পারেন নি রবীন্দ্রনাথ। তিনি গেছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সে দেশের মাটি আর মানুষকে চেনার উদ্দেশ্য নিয়ে। স্বদেশের সঙ্গে সেদেশের সম্পর্ক গড়বার আশা নিয়ে। যত অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছেন তার দলিলও রেখে গেছেন প্রচুর। কিন্তু এই শেষ পর্যায়ে এসে তিনি থেমেছেন। ঠিক ঠিক দেখতে গেলে এই পর্বে রাশিয়া ১৯৩০ ও পারস্য ১৯৩২ এই দুবার তিনি বিদেশ ভ্রমণে গেছেন তাও খুব অল্প সময়ের জন্য। অবশ্য চিত্র প্রদর্শনীর সূত্রে য়ুরোপের অন্যান্য দেশে তাকে যেতে হয়েছিল। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে এই দুটি দেশে ইতিপূর্বে তিনি একবারও যান নি, পরেও না।

আমরা জানি ১৯৭৫ সালে জ্ঞানাঙ্কুর প্রতিবিম্ব পত্রিকায় 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী' প্রবন্ধ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত। এরপর সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন করে ভাষণ, চিঠিপত্র, সাহিত্য সমালোচনা, সাহিত্যতত্ত্বালোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে তাঁর ভাবনাকে ব্যক্ত করেছেন। তাঁব গদ্য সাহিত্যের কালানুক্রমিক বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব যে তাঁর সৃষ্টিশীল গদ্যরচনার দশকগুলিতে তুলনামূলক ভাবে প্রবন্ধসাহিত্য কম রচিত হয়েছে। ১৮৮১-১৮৯০, ১৯০১-১৯১০ এবং ১৯৩০-১৯৪১ এই তিন দশক রবীন্দ্রপ্রবন্ধের আপেক্ষিক সংখ্যাধিক্য লক্ষ্যণীয় । আমাদের আলোচ্য দশকটিতে রবীন্দ্রগদ্য নাটক ও ছোটোগল্প সর্বাপেক্ষা কম লেখা হয়েছে। উপন্যাস তিনি সংখ্যায় অল্পই লিখেছিলেন এবং বিভিন্ন দশকেই তা ছড়িয়ে আছে।

তিরিশের দশকটিতে রবীন্দ্রসাহিত্য ভাবনা সরাসরি বাস্তবের ধূলিমলিন কর্মকেন্দ্রিক ভিত্তিভূমি আশ্রয় করেছে। এতদিন মাটির কাছাকাছি আসবার যে প্রেরণা তিনি অন্তরে অনুভব করেছিলেন, জীবনের শেষ পর্বে এসে তাকে প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করার দাবি জানালেন। শান্তিনিকেতনে সম্মিলিত রবিবাসরের সদস্যদের প্রতি সম্ভাষণ জানাতে গিয়ে এতদূর পর্যন্ত বলেছিলেন যাতে স্পষ্ট হয় যে, তাঁর স্রষ্টা রূপ নিয়ে যাঁর যা ইচ্ছা তিনি তাই বলুন, কিন্তু তাঁর কর্মী রূপটিকে যেন কেউ ছোটো করে না দেখেন— 'আজ আপনারা কবি রবীন্দ্রনাথকে না, তাঁর কর্মের অনুষ্ঠানকে প্রত্যক্ষ করুন, দেখে লিখুন সকলকে জানিয়ে দিন কতোবড়ো দুঃসাধ্য কাজের ভিতর আমাকে জড়িয়ে ফেলতে হয়েছে।

'আমি এতদিন পল্লী প্রকৃতির সৌন্দর্যের যে চিত্র এঁকেছি তা শুধু পল্লীপ্রকৃতির বাহিরের সৌন্দর্য্য; তার ভিতরকার সত্য রূপ যে কী শোচনীয়, কী দুর্দশাগ্রস্থ তা আজ আপনারা প্রত্যক্ষ করুন। আমাকে এখানে আপনারা বিচার করুন কবি রূপে না কর্মী রূপে'। (১০) তাঁর এই দাবি স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর জীবনে তাঁর সাহিত্যে। কর্মী রবীন্দ্রনাথ, ব্রাত্য, মন্ত্রহীন রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলেন চিঠিপত্রে, ভাষণে, বক্তৃতায় এককথায় সমগ্র চিন্তামূলক গদ্যরচনায়।

রবীন্দ্ররচনায় তিরিশের দশকটির প্রধান অবলম্বন হলো পরিণত মানব ভাবনা। 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক আমি তোমাদেরই লোক'— খুব সহজভাবে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটিয়েছেন— 'ওরা অন্ত্যজ-ওরা মন্ত্র বর্জ্জিত' । তাই তাঁর শিক্ষাভাবনা, পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনা, রাষ্ট্রচিন্তা, ধর্মভাবনা কিংবা স্মৃতিকথন প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই এক এবং অদ্বিতীয় হয়ে এসেছে মানুষ, একেবারেই সাধারণ মানুষ। সমগ্র বিশ্বের সংকটের মুহূর্তে তিনি আশাহত হয়েছেন তবু ধৈর্য সহকারে প্রতীক্ষা করতে চেয়েছেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ দেশ-কালের ঊর্ধ্বে যে মানব সেই মহামানবের আবির্ভাবের। অবশ্যই এই ভাবনা একেবারে অকস্মাৎ আবির্ভূত এমন নয়। কারণ প্রতিটি বিষয়েরই একটা পূর্বসূত্র থাকে। তাকে উপেক্ষা করলে আমাদের বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

সুতরাং রবীন্দ্রপ্রবন্ধে মানবভাবনার উৎসের দিকটিকে মনে রাখতে হবে।

এই পর্বের রবীন্দ্রভাবনায় অন্য যে দিকটি প্রত্যক্ষ করা যায় তা হলো ঐক্যতত্ত্বের প্রভাব। যে মানবসত্যকে তিনি আশ্রয় করেছেন তা মানব সমগ্রতার সত্য। মানুষের একাকীত্বকে তিনি স্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন— He

misses himself when isolalid; he finds him own larger truer self in his wide relationship (The religion of man) এই ঐক্যভাবন, রবীন্দ্রনাথের কী ধর্ম কী সমাজ কী রাষ্ট্র সকল ভাবনার ক্ষেত্রে এক আশ্চর্য সমন্বয়ের সূত্র রক্ষা করেছে। পল্লী উন্নয়নের সীমিত ক্ষেত্রে তিনি ঐক্যকে শক্তির উৎস রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। '. . . শক্তিকে যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি তাহলেই জিতব তাহলেই বাঁচব।' গ্রাম ও শহরের প্রতিটি মানুষের মধ্যেকার মিলন আবশ্যক। তবেই শক্তি আপনি সঞ্চিত হবে। তবেই জয় আপনি আসবে। দুই মহাযুদ্ধ মধ্যবর্তী অগ্নিভ বিশ্বে শান্তির প্রত্যাশায় ব্যাকুল প্রতিটি মানুষের কাছে তাঁর ঐক্যভাবনা দৈববানীর মতো প্রতিভাত হয়েছিল শান্তি সেখানেই যেখানে মঙ্গল, মঙ্গল সেইখানেই যেখানে ঐক্য। আবার এই ঐক্য ভাবনাই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল রাশিয়ায় রাষ্ট্রনৈতিক পালাবদলের প্রতি। যেখানে সাধারণ মানুষের ঐক্যশক্তি গড়ে তুলেছে নতুন সমাজ।

আমরা লক্ষ করেছি কেন যেন রবীন্দ্রনাথকে উপনিষদের প্রাণরস পুষ্ট আধ্যাত্মিক কবি, বাউল, বৈষ্ণব ভাবধারায় সঞ্জীবিত তপোবন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, বিশ্বপ্রেমিক ও মানবমৈত্রীর এক ধোঁয়াটে প্রচারক হিসাবে দেখাবার চেষ্টা প্রায়শই হয়ে থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরিচয় যে কেবল এটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয় এই সত্তাই যে তাঁর সবটুকু নয় রবীন্দ্রনাথের একটা বিপ্লবী,বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানধর্মী পরিচয় আছে এবং সেগুলির সমন্বয়ে তিনি যে এক আদর্শ মানুষ আমরা প্রায়ই সেকথা মনে রাখি না। বর্তমান সমাজজীবনে রবীন্দ্রনাথের যে বিপ্লবী সত্তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে, নাড়া দিতে পারে, অচলায়তন সমাজের স্থানু বিবেক কে শ্রদ্ধা নিবেদনের আড়ালে রবীন্দ্রনাথের এই সত্তাটিকে বড় বেশি আড়াল করে দেওয়া হয়। একদিকে রবীন্দ্রভক্তদের অতিপ্রাবল্য অন্যদিকে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমগুলির বিচিত্র চেষ্টা রবীন্দ্রনাথকে ক্রমেই যেন আমাদের কাছে সর্বশক্তিমান অথচ কোনোও কাজে লাগে না এই রকম এক মন্দির বিগ্রহে পরিণত করতে চলেছে। জন্ম ও মৃত্যু দিনটিতে বেশ কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর দু-একজন রবীন্দ্রপন্ডিত ব্যক্তিদের মুখে সামান্য কিছু অভিজ্ঞতার কথা সেই সঙ্গে শান্তিনিকেতনের দু'একটা স্থির কিংবা অস্থির চিত্র দেখিয়েই কাজ সারা হয়ে গেল। বাকী কাজ করল 'সংবাদ' কোথায় কখন কে, কে রবীন্দ্রমূর্তির পাদদেশে ও গলায় পুষ্প মাল্যদান করল তার নিখুঁত বিবরণ দিয়ে।

অথচ রবীন্দ্রনাথের যে দ্বিতীয় সত্তা তাকে যেন এড়িয়ে যেতে চাই, শুধু তাই নয় কতগুলি ভ্রান্তধারণার কুয়াশায়, নানা সুবিধাবাদী সিদ্ধান্তের হেঁয়ালীতে রবীন্দ্রনাথকে আচ্ছন্ন করে তাঁকে আমরা বড়জোর পূর্বাপর এক জাতীয়তাবাদী ভাবুক ও ধর্মপ্রবক্তা পাদ্রীর অনুকরণে সাজিয়ে তার উপরে আধ্যাত্মিক কবির আস্তরণ জড়িয়ে দিয়ে এক উচ্চ অভ্রমিনারে তুলে রাখার ব্যবস্থা করেছি। অর্থাৎ ঐ গীতাঞ্জলির অনুবাদ পর্যন্তই তাঁর জীবন ও সাহিত্যপরিচিতি সর্বজনীনতা পর্যায়ে এসে থেমে গেছে। কিন্তু তার পরেও যে রবীন্দ্রনাথ এগিয়েছেন এবং ঐ মিনারের দেবতা নিজেই ক্রমান্বয়ে নেমে এসে সমাজের পীড়িত শোষিত মানুষের সংগ্রামের একজন সমর্থক হয়েও কখনও কখনও সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছেন সে সত্যটি মুষ্টিমেয় শ্রেণীর উপলব্ধির পরিধিতে সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। অথচ ভারতবর্ষের বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনে যে দ্রুত অবমূল্যায়ন হয়ে চলেছে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথের

এই সজীব সত্তা আমাদের সংগ্রামকে অনেকখানি পুষ্ট করতে পারতো। প্রায়ই মনে হয় সমাজের এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে। সংগ্রামের পথে রবীন্দ্রনাথরূপী আলোকবর্তিকা সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশেই এই তথাকথিত শুদ্ধ জ্ঞানচর্চার আতিশয্য।

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই বঞ্চিত, পীড়িত মানুষের সপক্ষে চিরমুখর কিন্তু এমন একটা সময় গেছে যখন রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদী মন কেমন যেন অসহায়। কোথায় পাবেন প্রতিকার, কার কাছে চাইবেন বিচার, এই সমস্যা প্রশ্নের মুখে তিনি কেমন যেন বিহ্বল।

কিন্তু যতদিন গেছে, অভিজ্ঞতা বেড়েছে , ততই বিহ্বলতার দ্বন্দ্ব কাটিয়ে কবি সমাজ সচেতন এক ঋজু দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, নিজের দেশের ক্ষেত্রেই হোক, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেই হোক, উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছেন। ক্রমান্বয়ে উপলব্ধি করেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দরকার। সমস্যা হলো, অধিকাংশ রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ ও ভক্তবৃন্দ , রবীন্দ্রনাথের এই বস্তুনিষ্ঠ দিক নির্দেশ করলেই তাঁকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নামিয়ে এনে তাঁর অমর্যাদা করার অভিযোগ দায়ের করেন। তা করুন, উপায় নেই, বিশেষজ্ঞের দাবি নিয়ে নয়, সাধারণের চিন্তা যে কথা বলতে চায়, সেই কথাই সাহস করে বলবার প্রয়াস করেছি।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকার কথা না যে রবীন্দ্রনাথ একসময়ে বিশ্বাস করতেন যে আমাদের সমাজে ধনী থাকবে কিন্তু সে দান করবে, গৃহী আতিথ্য করবে, দরিদ্র এই দান গ্রহণে সার্থক হবে অর্থাৎ সম্পন্ন দরিদ্রের সেবা করবে আর দরিদ্র সেই সেবা গ্রহণ করবে— এটাই সমাজের শুভ কর্ম। কিন্তু লক্ষ করলে আমরা দেখবো ক্রমান্বয়ে সমাজ বিজ্ঞানের ধারায় রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছিলো। একসময় ছিল যখন কবি কৃষকদের কম্যুনিষ্ট প্রচেষ্টায় সংগঠিত হওয়াকে মোটেই ভালো মনে নিতে পারেন নি, বরং 'লাল জুজু'র সম্পর্কে ভয় এবং তারা কৃষকদের ক্ষতি করবে এই ধারণা পোষণ করতেন। আমরা রবীন্দ্রনাথের এই ধারণার সঙ্গে একমত নই, কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে কৃষকদের দুঃখ তাঁর চোখ এড়ায় নি এবং তাদের জন্য তাঁর সহানুভূতির অন্ত ছিল না। কিন্তু অভাব ছিল এই উপলব্ধির যে, ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে, অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পন করে, ভাববাদের কোলে আশ্রয় নিয়ে মুক্তির যে চেষ্টা সেটি কখনোই বাস্তব নয়। এই কারণেই কৃষকের দু'বিঘার সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন নিখিল বিশ্ব পাওয়ার অলীক কল্পনায়।

'শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই আর সবই গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন, 'বুঝেছি উপেন, এ জমি লইব কিনে'।
কহিলাম আমি, 'তুমি ভূস্বামী ভূমির অন্ত নাই।
চেয়ে দেখ মোর আছে বড়জোর মরিবার মতো ঠাঁই'।
শুনি রাজা কহে, 'বাপু জানো তো হে করেছি বাগান খানা
পেলে দুই বিঘে, প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা-

ওটা দিতে হবে।' কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পানি
সজল চক্ষে, 'করুন রক্ষে গরিবের ভিটেখানি।
সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সৈ মাটি সোনার বাড়া
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমন লক্ষ্মীছাড়া!'
আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে
কহিলেন শেষে ক্রুর হাসি হেসে 'অচ্ছা সে দেখা যাবে।'
পরে মাস দেড়ে মাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে-
করিল ডিক্রি; সকলই বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।
মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবেনা মোহ গর্তে,
তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু'বিঘার পরিবর্তে।'(১২)

(দুই বিঘা জমি/চিত্রা— সঞ্চয়িতা দশম সংস্করণ। পৃ: ২৩৮)

অত্যাচারিতের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ রূপপায় ভগবানের কাছে প্রশ্নে । বিচারের ভার তাঁর উপরেই ছেড়ে দিয়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব এবং বিরাটত্ব সেইখানে যে রবীন্দ্রনাথ ক্রমেই মানুষের অধিকারের প্রশ্নে — সে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দৃষ্টিতেই হোক, অথবা মানুষের অর্থনৈতিক সামাজিক প্রশ্নেই হোক, ক্রমান্বয়ে মাটির কাছাকাছি এসেছেন। তাই দেখি জীবন সায়াহ্নে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি 'আফ্রিকা' কবিতায় অত্যাচারীকে ক্ষমাপ্রার্থী হতে আহ্বান জানিয়েছেন। আবার একই সঙ্গে দানবের বিরুদ্ধে ঘরে ঘরে মানুষকেই প্রস্তুত হবার আহ্বান জানিয়েছেন—

' হায় ছায়াবৃতা
কালো ঘোমটার নীচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।
এল তরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে,
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ

নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে,
দস্যু পায়ের কাঁটা মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিন্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।
সমুদ্রপারে সেই মুহূর্তেই তাদের পাড়ায়-পাড়ায়
মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘন্টা
সকাল সন্ধ্যায় দয়াময় দেবতার নামে;
শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে;
কবির সংগীত বেজে উঠছিল
সুন্দরের আরাধনা।।
আজ যখন পশ্চিম দিগন্তে
প্রদোষকাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস,
যখন গুপ্ত গহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল—
অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,
এসো যুগান্তরে কবি,
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে;
বলো 'ক্ষমা করো'—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার স্যতার শেষ পূণ্যবাণী।'(১৩)

(আফ্রিকা/সাময়িক পত্র ১৯৩৬, সঞ্চয়িতা— বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ,
সপ্তম সংস্করণ— ৯৬৯, পৃ: ৭২২)

রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ধীরে ধীরে ভগবান, জীবনদেবতার স্থানে মানুষ, সেই মানুষ ও শ্রমজীবী মানুষ, তার শ্রম, শ্রমের অধিকার এবং সর্বোপরি সমাজ চিন্তায়, শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা ক্রমবিবর্তিত হয়ে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রজীবনের শেষের দশকটিতে তাই পরিণত মননের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ও মানুষের অধিকার সম্পর্কের

অন্ধকারময় দিকটির নিরপেক্ষ প্রতিচ্ছবি তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। সময়ে সময়ে যে প্রতিবাদ ব্যক্তির অস্তিত্ব ও অধিকার সংরক্ষণের জন্য যে প্রবল প্রচেষ্টা তা নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কবির মননে ও কর্মীর প্রয়োগে প্রত্যক্ষ রূপ পরিগ্রহ করলো। এবার আর বুদ্ধিজীবিদের বৈঠকখানায় না রবীন্দ্রনাথের স্থান হলো কৃষক, শ্রমিক, মজুর— ওরা যেখানে কাজ করে সেই কর্মভূমিতে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর এই পরিচয়েই শেষ পর্যন্ত সব থেকে বেশি খুশি হয়েছিলেন।

আবার স্বাধীনতার অর্ধশত বৎসর পরে আজও রবীন্দ্রনাথের এই মানব ভাবনা, ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তা চেতনা সাহিত্য, শিল্প, সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি এককথায় সমগ্র মননশীল জগৎকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। সেদিক থেকেও এই দশকের রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্য আমাদের দেশের সাধারণ পাঠকদের পক্ষে জানা অত্যাবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির এই একান্ত প্রয়োজনের দিকটা মনে রেখেই রবীন্দ্রজীবনের শেষ অধ্যায়টির (১৯৩০-১৯৪১) বিস্তৃত আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি। তাঁর লেখা মননশীল যুক্তিনিষ্ঠ রচনাগুলির সাহায্য নিয়েছি আমার এই বিশ্লেষণ যথাযথ করতে। কারণ চিঠিপত্র, ভাষণ, প্রবন্ধ, প্রভৃতির ধারা যত সহজে ও সরাসরি মানুষের মনকে ধরা যায় কাব্য কিংবা সৃষ্টিশীল গদ্যে ততটা নয়। তবে প্রয়োজনে সমসাময়িক ও আনুষঙ্গিক বিভিন্নরচনারও ব্যবহার করেছি।

মূল আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার পূর্বে একবার রবীন্দ্রপ্রবন্ধের তালিকাটি প্রস্তুত করে নেওয়া আবশ্যক —

রবীন্দ্র প্রবন্ধ রচনাপঞ্জী *১৯৩০-১৯৪১*

প্রথম অধ্যায় *সাহিত্যতত্ত্ব ভাষা ও ছন্দ*

সাহিত্যের পথে

সাহিত্যের স্বরূপ

বাংলা ভাষা পরিচয়

ছন্দ

দ্বিতীয় অধ্যায় *আত্মপরিচয় ও ছেলেবেলা*

আত্মপরিচয়—প্রবন্ধ সংখ্যা ৪

আত্মপরিচয়— প্রবন্ধ সংখ্যা ৫

আত্মপরিচয়— প্রবন্ধ সংখ্যা ৬

ছেলেবেলা

তৃতীয় অধ্যায় *চরিত্রপূজা ও চিঠিপত্র*

ভারতপথিক রামমোহন রায়, বড়োদিন, বুদ্ধদেব , খৃস্ট, মহাত্মাগান্ধী, বিদ্যাসাগর, স্মৃতি।

পথে ও পথের প্রান্তে।

পারস্যে।

চতুর্থ অধ্যায় *এজমের তীর্থদর্শন*

রাশিয়ার চিঠি, শিক্ষা, পল্লী প্রকৃতি, মানুষের ধর্ম।

পঞ্চম অধ্যায় *রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মতামত*

কালান্তর, সভ্যতার সংকট।

উৎস-নির্দেশিকা

১। মেঘনাদবধ কাব্য (মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রনীত) রবীন্দ্র রচনাবলী ১ম খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, ১৯৮৯ সংস্করণ।

২। প্রভাত সংগীত/ জীবন স্মৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী-একাদশ খন্ড, প্রকাশক পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৯। পৃ: ৭৩।

৩। মন্ত্রী অভিষেক / রাজা ও প্রজা, রবীন্দ্ররচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, প্রকাশক— পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০ পৃ: ৩২।

৪। সৌন্দর্যের সম্বন্ধ/ পঞ্চভূতের ডায়েরী— রবীন্দ্র রচনাবলী ১৫ খন্ড।

৫। রবীন্দ্রজীবন কথা/ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় , চতুর্থ মুদ্রন। পৃ:৭৪।

৬। বিদায়/ খেয়া, রবীন্দ্র রচনাবলী-দ্বিতীয় খন্ড। প্রকাশক- পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পৃ:১৬৭।

৭। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ—সাহিত্য চিন্তা। সত্যেন্দ্রনাথ রায়। প্রথম প্রকাশ। পৃ: ১১৬-১১৭।

৮। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম— রবীন্দ্র রচনাবলী ১৩ খন্ড।

৯। পথে ও পথের প্রান্তে, ১৩ নং চিঠি। রবীন্দ্ররচনাবলী-দ্বাদশখন্ড, প্রকাশক পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮৯, পৃ:৫০০।

১০। সম্ভাষণ/ পল্লীপ্রকৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী ত্রয়োদশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত ১৯৯০। পৃ: ৮১২।

১১। The Religion of Man , Hasper collins Publishers, Second impression, page :

১২। দুই বিঘা জমি/ চিত্রা— সঞ্চয়িতা, দসম সংস্করণ, পৃ: ২৩৮।

১৩। আফ্রিকা / সঞ্চয়িতা, ঐ, পৃ: ৭২২।